মানুষখোকো বাঘকে মারতে হবে

– আবুল হোসেন খোকন

বনের বাঘ বার বার ঢুকে পড়ছিল লোকালয়ে। ঢুকে মানুষ হত্যা করছিল। কাহাতক আর সহ্য করা! গ্রামবাসীরা তখন জোট বাঁধলো, এবং ঠিক করলো বাঘটিকে নির্মূল করতে হবে। অতঃপর সেইমতো বাঘ আটক করা হলো, এবং গণপিটুনি দেওয়া হলো। মারা গেল বাঘ। এরপর একে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হলো সবাইকে দেখার জন্য। এ ঘটনা শ্যামনগরের। শ্যামনগর সাতক্ষীরা জেলায়। আর সাতক্ষীরা হলো বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় সুন্দরবন সংলগ্ন একটি জেলা। গত ২১ জুন ২০০৮ এই পিটিয়ে বাঘ মারা এবং গাছে ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা ঘটে। খবরের কাগজগুলোতে এর সচিত্র বর্ণনা বেরিয়েছে কয়েকদিন ধরে।

বাঘের কথায় পরে আসা যাক। এখন লোকালয়ের আরেক দৃশ্যপটে আসি। বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সাবেক কর্মকর্তারা একটা কাজ করেছিল। তারা, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে জজ মিয়া নামে একজনকে ধরে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করেছল। সেই জজ মিয়া গ্রেনেড হামলা মামলায় দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিল। আর সাজানো এই স্বীকারোক্তি করার জন্য পুলিশের তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) থেকে জজ মিয়াকে প্রতিমাসে টাকা দেওয়া হতো। টাকার বিনিময়েই জজ মিয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে গ্রেনেড হামলার ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করায় সহযোগিতা দিয়েছিল। আর এই ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার কার্যটি সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেছিল পুলিশের ওই তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এই বানোয়াট স্বীকারোক্তি দিয়ে সিআইডিকে সহযোগিতা করায় জজ মিয়া আদালতের রায়ে এ মামলা থেকে খালাস পেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি সাংবাদিকদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল জজ মিয়ার মা জোবেদা খাতুন। এতে তদন্ত কর্তারা নাখোশ হয়েছিল এবং প্রতিহিংসাপরায়ন হয়েছিল জোবেদা খাতুনের ছেলে জজ মিয়ার উপর। সে কারণে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার আগেই সিআইডির সাবেক তিন কর্মকর্তা পরিকল্পিভাবে জজ মিয়াকে একটি বিস্ফোরক মামলায় আসামী করে দেয় এবং ২০০৫ সালের ২ নভেম্বর এই মামলায় জজ মিয়ার ৭ বছরের কারাদণ্ড হয়ে যায়। ফলে গ্রেনেড হামলা মামলায় জজ মিয়া খালাস পেলেও জেল থেকে মুক্ত হতে পারেনি ওই ৭ বছরের কারাদণ্ডের কারণে। এই বিস্ফোরক মামলায় জজ মিয়াকে আদালতে হাজির করা হয়নি, জজ মিয়া নিজেও মামলার ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি। মজার আরও ব্যাপার হলো, যে বিস্ফোরক মামলায় জজ মিয়ার ৭ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় সেই মামলার বিচারক ছিলেন তৎকালীন ৫ নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, যিনি কিনা ঢাকার মিরপুর এলাকার বিএনপি দলীয় একজন ওয়ার্ড কমিশনারের সহোদর [সূত্র : দৈনিক সমকাল, ২০ জুন ২০০৮]।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর জজ মিয়াকে আটক ও স্বীকারোক্তি আদায় করে সিআইডির সাবেক তিন কর্মকর্তা রুহুল আমিন, আব্দুর রশিদ ও মুন্সি আতিকুর রহমান সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, তারা ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় অন্যতম আসামী জজ মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে। এরপর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ভূঁয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই করিৎকর্মা পুলিশের তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রতি। সেইসাথে বাবর এজন্য সরকারীভাবে ১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে সিআইডির ওই তিন কর্মকর্তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'মাস না যেতেই যখন

জজ মিয়ার মা আসল ঘটনা ফাঁস করে দেয়, তখন বিপাকে পড়ে সিআইডির ওই কর্মকর্তারা। কারণ সে অবস্থায় জজ মিয়া ছাড়া পেলে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারতো এবং এতে সিআইডি কর্তাদের জটিল সমস্যায় পড়তে হতো। তাই তাকে আটকে রাখার জন্য বিস্ফোরক মামলায় ফাঁসিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না।

এই হলো একটি ঘটনা। আরেকটি ঘটনা দেখা যাক। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলার ঘটনা ধামাচাপা দিতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চেষ্টার কমতি ছিল না। বিশেষ করে বানোয়াট স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য শেখ হাসিনার দলের লোকদের আটক করে হাত-পা-চোখ বেঁধে চালানো হয়েছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন। সর্বাঙ্গে ডাণ্ডাপেটা করা, হাতের-পায়ের নখে সূঁচ ফোঁটানো, পায়ু পথে গরম বা সেদ্ধ ডিম ঢোকানো, দুই হাত বেঁধে উলঙ্গ অবস্থায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে গোপনাঙ্গে ইট বেঁধে দেওয়া, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, শুইয়ে নাকে-মুখে পানি ঢালাসহ পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার এসব নিরীহরা জানতেই পারেননি কখন রাত কখন দিন পার হয়েছে। সিআইডিকে সহায়তার নামে এই নির্যাতনে ভূমিকা রাখতে র‍্যাবও কম যায়নি। নির্যাতনের শিকাররা বলেছেন, মালিবাগের সিআইডি অফিসটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর টর্চার সেলে পরিণত হয়েছিল। গ্রেনেড হামলার হোতা বানানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিল, সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক মেয়র হানিফ প্রমূখের নাম বলাতে গ্রেফতারকৃতদের উপর হেন কাজ নেই– যা করা হয়নি। নির্যাতনের শিকার গ্রেফতারকৃত হাজি মোখলেছুর রহমান পরে বলেছেন, জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের ইচ্ছামতো সাজানো স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার উপর মালিবাগের সিআইডি অফিসে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। শৈবাল সাহা পার্থ বলেছেন, স্বাকারোক্তি আদায়ের জন্য গোয়েন্দা অফিসাররা ২৪ ঘণ্টা চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে রেখে বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার পাশাপাশি লাঠিপেটাসহ টানা ১৮ দিন আটকে রেখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্টাইলে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। আখতারুজ্জামান আতা ও জহির হোসেন লিটন বলেছেন, র‍্যাব এবং সিআইডি অফিসাররা হাত-পা-চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দিনের পর দিন একটানা বর্বরতা চালিয়েছে। তুষার আহমেদ হাসান বলেছেন, নির্যাতনকারীরা তার গোপনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক এবং পায়ের পাতায় লাঠিপেটা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম বলানোর জন্য চাপ দেয় এবং বলে, নাম বললে ১০ কোটি টাকা অথবা বিদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। অলিউলাহ ও আব্দুর রহিম বলেছেন, তাদের নানা ধরনের নির্যাতন করা হয় এবং হাত-পায়ের আঙুলে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয় [সূত্র : দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৭ জুন ২০০৮]। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ১১ জুন ২০০৮ প্রায় ৪ বছর পর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার চার্জশিট দেওয়ার মাধ্যমে এদের সবাইকে মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এখানে না বললেই নয় যে সিআইডি, র‍্যাব, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাসহ খোদ সরকার তখন গ্রেনেড হামলার প্রকৃত হোতাদের আড়াল করতে শুধু আওয়ামী লীগ নেতাদের অভিযুক্ত করতেই সর্বশক্তি ব্যয় করেনি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক এবং বিশিষ্ট দেশপ্রেমিকদেরও অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এ লক্ষ্যে তারা মামলার যাবতীয় চার্জও তৈরি করেছিল।

কিন্তু এখন লক্ষ্য করার বিষয় হলো– সেই খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিজামী, তারেক রহমান, লুৎফুজ্জামান বাবরসহ তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা দৃশ্যত ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় বর্তমান সরকার আমলে ওই গ্রেনেড হামলা মামলার চার্জশীট দেওয়া হয়েছে, যা দাখিল এবং তৈরি করেছে ওই সিআইডি'ই। দীর্ঘ ৪ বছর পর ১১ জুন ২০০৮-এ প্রকাশ করা এই চার্জশিটে এ মামলায় কিছু আটককৃতকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং আর কিছু আটককে মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আগের তালিকার আরও কিছু আসামীকে অব্যহতিও দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

উলেখ না করলেই নয় যে, স্বীকারোক্তির মহাত্ম কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে জেনে গেছি। এবারের চার্জশিটে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা প্রায় সবাই ইসলামী সন্ত্রাসবাদী দলের ক্যাডার। চার্জশিটে বলা হচ্ছে যে তারা নাকি তাদের স্বীকারোক্তিতে বলেছে, ইসলামের শত্রু হিসেবে শেখ হাসিনাকে শনাক্ত করা হয় এবং এ জন্যই তাকে হত্যার জন্য তারা এই গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। ইসলামী সন্ত্রাসবাদী ক্যাডার মুফতি হান্নানসহ ২২ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করার পর সিআইডি প্রধান এডিশনাল আইজি জাভেদ পাটোয়ারী সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ২৮ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু ঘটায় এবং বাকি ৪ জনের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না পাওয়ায় ৬ জনের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে সিআইডি কর্মকর্তাদের অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, এদের অনেকেই অবসরে গেছেন, তাই তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

বর্তমান কথিত নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নতুনভাবে তৈরি করে দাখিল করা ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার চার্জশিট বিশেষণ করলে কয়েকটি জিনিস দেখা যাবে– যার অন্যতম হলো, এই মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর আসামী হয়নি। আসামী হয়নি বেগম খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিজামী, তারেক রহমান গং। আসামী হয়নি তৎকালীন এনএসআইয়ের প্রধান মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, যে কিনা রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে এই গ্রেনেড হামলার কাজে ব্যবহার করেছিল (যার কারণে গ্রেনেড হামলার সময় বিশেষ সংস্থার একটি গাড়িও নিকটবর্তী স্থানে ব্যাকআপ হিসেবে অবস্থান করছিল), যে কিনা রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নিয়ে এ জন্য লুৎফুজ্জামান বাবরসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছিল, ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের ভাড়া করেছিল, সীমান্ত পার করে তাদের নিয়ে এসেছিল (এইসব কারণে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীকে বরখাস্ত করেছে)। এসব ঘটনার কথা সবিস্তারে তখন খবরের কাগজগুলোতে বড় বড় হেডিংয়ে ছাপাও হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে চার্জশিটে এদের কারও নাম আসেনি বা এরা কেউ অভিযুক্ত হয়নি। এমনকি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনার পর বিদেশি গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা তদন্ত করেছে, দুইটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং তদরন্তর রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে– যাতে মূল হোতাদের ব্যাপারে অনেক কিছুই উলেখ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও চার্জশিটে দেখা যাচ্ছে, সব হাওয়া!

এতেকরে পরিস্কার যে, আবারও জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গ্রেনেড হামলা ও হত্যাকাণ্ডের গডফাদারদের আড়ালে রাখা হলো এবং তাদের রক্ষা করা হলো। শুধু তাই-ই নয়, যারা আলামত নষ্ট-ধ্বংস করে সব প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য কাজগুলো করলো– তারা সবাই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। খালাস পেয়ে গেল আসলেরাই। আর যাদেরকে 'স্বীকারোক্তি' নামের বলির পাঠায় পরিণত করা হচ্ছে– মনে হচ্ছে তাদের দিয়ে শায়খ রহমান-বাংলাভাইদের মতো 'নিজেদের ঘাড়ে সকল দায় নিয়ে' আসল বা গডফাদারদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত করে দিয়ে যাওয়ার কাজটিই সম্পন্ন করা হচ্ছে। আর এই গুরুকার্যটি সম্পাদনের জন্য আগের মতো এবারেও ভূমিকা রাখলো ওই সিআইডি'র লোকেরাই।

এখানেই আসছে বাঘের কথাটি। বাঘ বার বার মানুষ খায়, আহত করে, জ্বালাতন করে, দেশ ও সমাজময় জুড়ে জটিলসব সমস্যা তৈরি করে। কিন্তু মানুষ তো এমনটা চায় না। চায়ওনি কখনও। তারপরেও মানুষকে ছাড়ছে না বাঘ। মানুষ চেয়েছে শান্তি, কূট-রাজনীতির অবসান। চেয়েছে জ্বালাতনকারীদের, আসল অপরাধীদের শনাক্ত করে তাদের শাস্তি। কিন্তু তারপরেও প্রাপ্তি ঘটছে না কিছুই। তাই কূট-রাজনীতি দেখতে দেখতে মানুষকে চরম ত্যক্ত-বিরক্ত হতে হচ্ছে। অতীত থেকেই তারা এই অবস্থার শিকার হয়ে আসছেন। এমনকি গত দু'বছরেরও মানুষকে কম কূট-রাজনীতি দেখতে

হয়নি। তারা দেখেছেন, জনপ্রিয় নেতাদের কী ভয়ঙ্করভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। দুর্নীতির দায় চাপিয়ে কতো নকলদের আসল বানানো হয়েছে, আর আসলদের নকল বানানো হয়েছে। আরও দেখেছেন, কূট-রাজনীতি সফল করতে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার শিরোমনিদের রক্ষা করার জন্য করিৎকর্মারা কীভাবে কাটাদিয়ে কাটা তোলার মাধ্যমে নিজেদের এবং গডফাদারদের হীনস্বার্থ হাসিলের মহোৎব কায়েম করেছে। তাদের মাধ্যমে কী চমৎকারভাবে কাস্টডির গোপন তথ্য সিডি আকারে, নিউজ আকারে জনসম্মুখ্যে প্রচার হয়েছে, বিদেশ-বিভূইয়ে পৌঁছে গেছে। এগুলোর কোনটিরই কিন্তু কৈফিয়ত, জবাবদিহিতা, বিচার, সাজা– কিছুই হয়নি। সব অপরাধ যেন বহাল তবিয়তে বর্তে যাচ্ছে। সে কারণেই বাঘের উদাহরণটি এসে যাচ্ছে। সাতক্ষীরার বাঘের চার্জশিট যেমন বাধ্য হয়ে লোকালয়ের মানুষকেই তৈরি করতে হয়েছে, এখানেও হয়তো সেটা করার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। কারণ মানুষখোকো বাঘ যদি বার বার ঘায়েল করে, ঘোট পাকায়, কূট-রাজনীতি করে– তাহলে তাকে তো ছাড় দেওয়া যায় না। মানুষখোকো কূট-নীতি যদি এরপরেও দাবি করে 'আমাকে মেরো না, কারণ আমি এ মাটিরই সন্তান' তাহলে কি লোকালয় বাঁচবে? বাঁচবে না। সুতরাং মানুষকে বাঁচতে হলে বাঘকে মারতে হবেই– যদিনা সে মানুষ খাওয়া বন্ধ না করে।

[তারিখ : ২৬ জুন ২০০৮]

- **আবুল হোসেন খোকন : সাংবাদিক-কলামিস্ট-লেখক ও মানবাধিকার কর্মী।**